জাগরণ এই ধাবমান কালে

জাফর ওয়াজেদ

ভাষার মাস ফেব্রÇয়ারি। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এ মাসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একুশে ফেব্রÇয়ারির কৃতিত্ব ও কীর্তিকে বাঙালী জাতি তার ঐতিহাসিককালের আর সমস্ত কৃতিত্ব ও কীর্তিরাজির শীর্ষে স্থান দিয়েছে। ফেব্রÇয়ারির শেষ পর্যন্ত বাঙালী জাতি তার পাকিস্তানী শাসনাধীন জীবনের এ কৃতিত্ব নিছক স্মরণ করে না। শুধু শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক স্থাপন করে শ্রদ্ধা প্রর্দশন করে না 'ভায়ের রক্তে রাঙা' রাজপথের তরুণ শহীদদের। জাতি ফেব্রÇয়ারির দিনগুলোতে উপলব্ধির অন্তর্গভীরে প্রবেশ করে এবং তার জাতীয় জীবনের লাভ-লোকসানের খতিয়ান করে। এমন ঐক্যবদ্ধ তারা অন্য কোন সময়ে হয় না। একুশে ফেব্রÇয়ারি এক বিমূর্ত মহান অনুভূতি তার সর্বগ্রাসী প্রভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে পুরো জাতিকে। তাই শুধু শহর-বন্দর নয়, পল·ীর স্কুল-কলেজেও দেখা মেলে শহীদ মিনারের। দেশের এই হাজার হাজার শহীদ মিনারে ২১ ফেব্রÇয়ারিতে পুষ্পস্তবক নিবেদিত হয়। প্রতিটি শহর-বন্দর, গ্রামগঞ্জে এ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তারপর হয় সভা-সমিতিসহ নানান অনুষ্ঠানমালা। সত্যিই বাঙালী ভোলেনি সেই রক্তমাখা দিন। কখনও প্রদর্শন করেনি উদাসীনতা। সর্বস্তরের গণমানুষের কাছে একুশের আবেদন যেন জাতিসত্তার মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। এ মাসে জাতি সচেতন হয় যে, ধর্মবর্ণ যার যা হোক, সামগ্রিকভাবে বাঙালী একটি অবিভাজ্য জাতি। এ জাতি একটি সমন্বিত সংস্কৃতি এবং একটি সমন্বিত জীবনবোধের অধিকারী। তার সাহিত্য, তার সঙ্গীত ও সুর, তার তৈজসপত্র, তার জীবনযাপন প্রণালী এবং অর্থনীতি এক ও অভিন্ন। এগুলো সেই সমন্বিত সংস্কৃতির অকাট্য প্রমাণরূপে বিদ্যমান। তাই এ মাসে বাঙালী তার ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ হয়ে ওঠে। অভিন্ন অনুভূতির এক গ্রোতধারায় অবগাহন করে প্রতিবছর নতুন করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় লক্ষ্যাদর্শ পূরণে। অন্য সময়ে যারা শরিক হন না, অথবা কর্তব্যকর্মে গাফলতি করেন, তারাও সজাগ এবং কর্তব্যসচেতন হন এ সময়টাতে। জনগণের সঙ্গে, জনতার মিছিলের সঙ্গে, জাতির অর্ধমগ্নচৈতন্যে বিদ্যমান অনুভূতির সঙ্গে যোগদান করেন তারাও। কেননা তারা জানেন, এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সাথে যারা করেছিল বিশ্বাসঘাতকতা ও দুশমনি, তারাও জানে ফেব্রÇয়ারির দিনগুলোতে জাতি কোনরূপ উদাসীনতা ও শৈথিল্য সহ্য করবে না। সহ্য করবে না বাঙালীর স্বাধীনতা চেতনার মূল ভিত্তিভূমিতে কোনরকমের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত। জাতি এ সময়টাতে তার ভেতর-বাইরের শত্রু-মিত্রদেরও চিহ্নিত করে এবং যে ক্ষেত্রে যেমন কর্তব্য, তা নির্ধারণ করে পরবর্তী বছরের জন্য পথ বেছে নেয়। বাংলাদেশে আগেও বিভীষণরা ছিল, সবদেশেই কমবেশি থাকে, এখনও আছে। কিন্তু বাইরের শত্রুরা যেমন পরাজিত হয়েছে তেমনি ভেতরের বিভীষণরাও ইতোপূর্বে পর্যুদস্ত হয়েছে।

১৯৭১ সালে যে সকল বহির্শক্তি বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনায় পাকিস্তানকে সর্বপ্রকারে মদদ যুগিয়েছিল, যারা বঙ্গবন্ধুর আততায়ীদের হাতে শহীদ না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়নি, সেই সব বহির্শক্তির অনুপ্রেরণায় পুনরায় ঘরের শত্রু বিভীষণরা ঐক্যজোট বেঁধে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিস্তার ঘটিয়েছে। এরা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে আজও লিপ্ত রয়েছে। জাতি তাদের পরিচয় জানে।

বাংলাদেশের মানুষ এখনও অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং নানা অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এখানে শ্রেণীভেদে শিক্ষার ভেদাভেদ বিদ্যমান। বিদ্বান এবং সুশিক্ষিতরা একটি আলাদা শ্রেণী। ওরা শাসকশ্রেণীও বটে। সাধারণ দেশবাসীর জন্য শিক্ষাব্যবস্থা যাই হোক না কেন, তাতে এ শ্রেণীটির লাভ-লোকসান নেই। ওরা ইংরেজ-পাকিস্তানী আমলেও আলাদাভাবে সময়োপযোগী শিক্ষা পেয়েছে, এখনও পাচ্ছে। সাধারণ দেশবাসীকে অদ্যাবধি বর্তমান যুগের এ সর্ববাদীসম্মত সত্যটি বুঝিয়ে বলা হয়নি যে, পৃথিবীর সকল সভ্য ও উন্নত দেশের মানুষ একমাত্র যার যার মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করেই সভ্য হয়েছে এবং উন্নতি লাভ করেছে। এ কথাও বলা হয়নি যে, ইংরেজী, ফারসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালে উন্নতি লাভ করেছে। এবং এ কথাও ওদের বুঝিয়ে বলা হয়নি যে, বাহ্যিক আচার-আচরণের মধ্যেই কেবল পূণ্য নয়, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে একটি উপলব্ধি, প্রকৃত জ্ঞানই শুধু মানুষের মধ্যে সে উপলব্ধি জাগ্রত করতে পারে এবং একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই সে জ্ঞান আহরণ সম্ভব। আমরা সাধারণ বাংলা ভাষীরা কোরআনের বাংলা তর্জমা পড়েও আল্লাহর বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারি। এই অতি সহজ-সরল কথাটা পর্যন্ত বোঝার এবং বোঝাবার লোক দেশে অল্প। এক কথায় একটি জটিল প্রশ্নমালার সঠিক জবাবদানের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রস্তুতি বাংলাদেশে নেই। কখনও কেউ প্রস্তুত করার চেষ্টাও করেনি। বরং এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, পুরো ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে শিক্ষা এবং ধর্মের নাম করে সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষের মধ্যে মূর্খতা সম্প্রসারণের সজ্ঞান প্রচেষ্টা চলেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে তারই ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতা এসেছিল এই ধর্মান্ধতার বিপরীতে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুহীন দেশে ধর্মের নাম করে মূর্খতা ও গোমরাহী সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা পাকিস্তান আমলের চেয়ে জোরেশোরে চলেছে। আর সেই চলার কারণে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ,

জঙ্গীবাদ, ধর্মান্ধতার প্রসার ঘটেছে। জাতি তাই একুশেতে শপথ নিচ্ছে এদের বিনাশ সাধনে। বাঙালী জাতিসত্তার বিরুদ্ধে যখনই এসেছে আঘাত, তখনই প্রত্যাঘাত হয়েছে। এমনিতে বাঙালী জাতি হিসেবে অত্যন্ত সহজ-সরল। কিন্তু কঠিন হতেও দেরি হয় না, তার প্রমাণ সে রেখেছে অতীতেও। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে একটা প্রচন্ড চেঁচামেচি, হৈ-হল্লা চালানো হচ্ছে। চিৎকার করা হচ্ছে, দেশের কোথাও ভাল কিছু হচ্ছে না। দেশ দ্রçত সর্বনাশের পথে এগোচ্ছে। এই দুর্মুখরা একাত্তরের পরাজিতদের ক্রোড়ে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করছে, শহীদদের সংখ্যা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রçপ করছে। একুশে ফেব্রçয়ারি এসব উপড়ে ফেলার প্রেরণা দেয়। যদিও এদের মিথ্যাচার সীমাহীন।

অযথা বিলাপের সঙ্গে সত্যের অপলাপ, আক্ষেপ-বিক্ষেপের সঙ্গে বক্রোক্তি, কটূক্তি, অতিরঞ্জনের সঙ্গে অপভাষণ এটি এখন দেশব্যাপী একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে যেন। ব্যাধি তো বটেই, হিস্টিরিয়াও হতে পারে। কখনও কঠোর ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করছে, কখনওবা দ্রিçপের কশাঘাত করছে। মনে হয় বাঙালীর স্বভাবেই এই ব্যাধি রয়েছে। দোষান্বেষী স্বভাব, ছিদ্রান্বেষণী স্বভাব। এমনিতেই কাউকে ছেড়ে কথা কইতে চায় না। দোষ পেলে তো কথাই নেই। সাধারণ কথাবার্তায় উপহাস-পরিহাস লেগেই থাকে। খোঁচা দিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। এর একটি গুণের দিকও রয়েছে নিশ্চয়ই। হাস্যরসের চর্চা একদা বাঙালী চিত্তকে সরস করেছিল। বাঙালীর এই স্বভাবের দরুন আর কিছু না হোক, পরোক্ষভাবে নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে কিছু সহায়তা অবশ্যই করেছে। বাদ-প্রতিবাদের বেলায় কটূক্তি ব্যঙ্গোক্তি ব্যবহার হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু শালীনতার হানি হয়নি। তবে অনেকের ভাষা ঠিক স্বভাবসঙ্গত ভাষা নয়। ভাষাটা মনে হয় কেমন যেন অকারণে কলহপ্রবণ, উদ্দেশ্যটা যেন গায়ের ঝাল মেটানো। সব ভাষাই জাতীয় চরিত্রের প্রতীক। বাংলাভাষার বেলায় এটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট। জাতীয় চরিত্রের বহুগুণ সন্নিবেশে এই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। আজকাল সে ভাষায় যে রূঢ়তা এমনকি স্থূলতা দেখা দিয়েছে, সেটি আদৌ শুভলক্ষণ নয়। মনে হয় বাঙালী চরিত্রেরই কোন একটি গ্রন্থি যেন ছিঁড়ে গেছে এবং তারই ফলে ভাষার ব্যবহারে শৈথিল্য প্রকাশ পাচ্ছে। বিরোধে-বিদ্বেষে দলীয় নেতাদের মন তিক্ত। দলগত মতি-গতির ফলে মনে প্রসন্নতার অভাব ঘটেছে। মনে প্রসন্নতা না থাকলে মুখের কথায়, লেখার ভাষায় প্রসাদগুণ আসে না। বলা নিষ্প্রয়োজন, এখানে সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে না। লেখক-সাহিত্যিকরা ভাষা সম্পর্কে সর্বদাই সজাগÒ এ ধারণাটি বদ্ধমূল। কাজেই সাহিত্যের ভাষা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এখানে বলা হচ্ছেÒ নিত্যদিন যে ভাষা আমরা বলছি, শুনছি টিভিতে, দৈনিক পত্রে যে ভাষা নিত্য পড়ছি; সেই ভাষার কথা। সাহিত্যের ভাষার চাইতেও এটি বড় জিনিস। কেননা এ ভাষার মধ্যেই জাতির প্রকৃত পরিচয়। ভাষা যদি ক্রমেই উগ্র থেকে উগ্রতর হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে, জাতির চরিত্রে কোথাও বৈকল্য ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে, বাংলা এমনকি ইংরেজী, এই উভয় ক্ষেত্রেই ভাষাকে পালোয়ানি ভঙ্গিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভাষাকে যদি একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়, তাহলেও মনে রাখা প্রাসঙ্গিক যে, যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে সেভাবেই তাকে ব্যবহার করতে হবে। লেখকের লেখনী ভীমের গদা নয়। গদা অতি স্থূল অস্ত্র। ভীমের হাতেই মানায়। কর্ণ বা অর্জুনের হাতে মানায় না। ভাষা হলো শব্দভেদী বর্ণ। শব্দকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে অনায়াসে মর্মভেদ করতে পারে। পালোয়ানির প্রয়োজন হয় না।

ভাষা যে ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠছে, তা প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতার লক্ষণ। এই যে ভাষা ধীরে ধীরে বিকৃত হচ্ছে, সেজন্য অনেকাংশে দায়ী উপনিবেশিক মানসিকতাজাত নিন্দুকেরা। কারণ তারা হয় দুখে হাপুস নয়ন, না হয় তো ক্রোধে উন্মত্ত। কাজেই বাক্যে ব্যবহারে তারা খুব স্বাভাবিক নন। একটু নাটুকেপনার ভাব আছে। সেটা হাস্যকর। কারণ অনেকটা যেন সার্কাসের ক্লাউনের ভাব এসে যায় তাদের। কোন বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে অপভাষা ব্যবহার যেন স্বাভাবিক। ফেসবুক, টুইটারে ভাষার নানামুখী ব্যবহারের দেখা মেলে। দেশের উন্নয়ন বিরোধীরা দেশের ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান সম্বন্ধে ভেবে আকুল। স্বভাববশে কোথাও একরত্তি ভাল কিছুই দেখতে পায়ন না। একটুতেই ক্রুদ্ধ, অপভাষা প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। "পুলিশরাই পেট্রোলবোমা মেরে জীবন্ত মানুষ হত্যা করছে, সরকার নিজেই জঙ্গীদের ব্যবহার করছে, শেখ হাসিনা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে গ্রেনেড নিয়ে নিজেরাই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে" ইত্যাদি অজগ্র উদাহরণ টানা যায়। তার এসব মিথ্যাচার কোন সম্ভ্রান্ত পত্রিকায় ছাপা হওয়া উচিত নয় মনে হলেও বাস্তবে দেখা যায়, সেসব পত্রিকা এসব কদর্যভাষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে পানি ঘোলাটে করার জন্য। পঁচাত্তর পরবর্তী ক্ষমতা দখলকারীদেও উত্তসূরিরা এখনও ইতিহাসকে বিকৃত শুধু নয়, রক্তে অর্জিত সংবিধান পাল্টে ফেলতে চায় পুরোদস্তুর। আসলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান থাকে না। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি নিজেই নিজের বিনাশ সাধন করেন। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি লোকসমাজে নিজেকে অশ্রদ্ধেয় করে তোলেন। যেমন 'শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন' মার্কা মিথ্যাচার তাদেরকে বাংলাদেশবিদ্বেষী পাকিস্তানপন্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, বলা যায় অনায়াসে।

এই অপশক্তি বিশ্বব্যাপী দেশ নিন্দার এক কোরাস জুড়ে দিয়েছে। চেঁচামেচি করে দেশময় উত্তেজনা-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় বরাবর। অথচ ধীরস্থির শান্তভাবে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় দোষত্রুটির সমালোচনা করলে দেশের ভাল ছাড়া মন্দ হয় না। সুচিন্তিত সমালোচনা

দেশের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাদের ভাষণ দেশের অস্তিত্ব ধরেই টান মারে। দেশপ্রেম শিকেয় ঝুলিয়ে রেখে তাই মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা হয়। তাদের মুখে যে অবিরাম মিথ্যাচার চলছে, এতে দেশের, রাজনীতির লাভ কিছুই হচ্ছে না। বরং ক্ষতিই হচ্ছে। আর এই ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলার কাজটি তারা অবলীলায় চালিয়ে যাচ্ছে। অনবরত হতাশাব্যঞ্জক, দেশবিরোধী বক্তব্য শুনে তাদের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাই তাদের এখন চোরাবালিতে খাবি খেতে হচ্ছে। এদের দেশপ্রেম স্বার্থগন্ধে কলুষিত বলেই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ফেব্রçয়ারি আমাদের চোখের দৃষ্টি, অন্তরের আবেগকে এমনভাবেই সমৃদ্ধ করে যে, এসব জঙ্গী, সন্ত্রাসবাদী, যুদ্ধাপরাধীকে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে স্বাধীনতার ধারাকে অক্ষুণÁ রাখার ব্রতে। বাঙালীর জাগরণ ঘটেছে ইতিহাসের প্রতি পদে। শত বাধা, শত বিঘÁকে সে ধূলিসাৎ করতে পেরেছিল। আজকেও সেই পথেই হেঁটে যাচ্ছে। ফেব্রçয়ারির বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠছে স্বাধীনতার মন্ত্রগুলো। মার্চের গৌরবগাথাকে সামনে এনে দানবের বিরুদ্ধে মানবের জয়কে কেউ রুখে দিতে পারেনি, পারবেও না। বাঙালী মাথা নত না করা জাতি বলেই সে পাড়ি দিতে পারে নিধুয়া পাথার।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

#

পআিইডি ফচিার